আইন আছে! আইন নাই

উদিসা ইসলাম

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নারীর সাবলীল যাপিত জীবন নিশ্চিত করার চিন্তা ও দাবি আজকের নয়। আর 'আধুনিক' সমাজে এসব নিশ্চিত করতে সবার আগে তৈরি হয় আইন। ইহা করিলে তোমার এই দণ্ড হইবে, সুতরাং অদ্য হইতে তুমি নিজেকে বিরত করো! কিন্তু কখনো বাধা নিষেধের মধ্যে ফেলে কোনো অপরাধ প্রবণতা বন্ধ করা গেছে বলে কারোর জানা নেই। প্রয়োজন আইনের পাশাপাশি এর প্রায়োগিক শিক্ষা এবং সামাজিক জ্ঞানের পরিসর বাড়ানো।

ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার কারণ হলো, আমাদের আইন এবং এর প্রায়োগিক দিকের যত জটিলতা তৈরি হয় আমাদেরই কারণে সে বিষয়ে আলাপের সুযোগ তৈরি করে নেওয়া। পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যখন আপনি সেই বিচারের পথটিকে বেছে নিবেন তখন দেখবেন, যে-আইনকে আপনি রক্ষাকবচ ভাবছেন, সেটাই প্রয়োগের রাস্তা ঠিক না থাকায় আপনার চারপাশে ভিন্ন পরিবেশ তৈরি করছে।

সম্প্রতি নাজনিন আক্তার হ্যাপি জাতীয় দলের ক্রিকেটার রুবেল হোসেনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। চারপাশে তোলপাড়। সম্মতির ভিত্তিতে হওয়া সম্পর্ক, বিবাহ-বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক এবং পরবর্তী সময়ে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হতে অস্বীকৃতি ধর্ষণ রূপে গণ্য হবে কি না। আলাপের কোনো শেষ নেই। সেলিব্রেটির 'ভিকটিমাইজড' জীবনকে আমরা আরো বেশি সেলিব্রেট করার উপযোগী করে তুলি সম্মতি-অসম্মতির লড়াইয়ের ভিতর ফেলে। নারী যখন সিদ্ধান্ত নেন তার সাথে কোনো অন্যায় হচ্ছে, চাইলে তিনি মামলা করবেন। তিনি দেখেন হাজারো আইন সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু আসলেই কি তাই? যখন সে মামলা করতে জায়গামতো পৌঁছায় তখন সে দেখে তাকে তার মতো করে ন্যায়বিচারের জন্য এগিয়ে যাবার উপযোগী প্রয়োজনীয় আইন আসলে নেই!!

প্রেমিকের বিয়ের আশ্বাসের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাসের পর প্রেমিক তার সাথে সম্পর্ক রাখতে না-রাজি জানিয়েছে বলে হ্যাপির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ। হ্যাপি ভীষণ প্রতারিত বোধ করে থানায় গেলেন এবং সেখানে ধর্ষণ মামলা দিলেন। কেন? হ্যাপির বক্তব্য হলো, তিনি থানায় প্রতারণার মামলা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাকে আইন বুঝিয়ে ধর্ষণের মামলা দায়ের করতে বলেছে। এবার শুনি মিরপুর থানার পুলিশ কী বলছে, 'হ্যাপির অভিযোগ অনুযায়ী প্রতারণার মামলা করার কোনো সুযোগ নেই। তাই সংশ্লিষ্ট ধারায় নারী নির্যাতনের মামলা নেওয়া হয়েছে।'

হ্যাপির দাবি, 'রুবেল আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আমি তার বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলাই করতে চাই।'

এ বিষয়ে মিরপুর থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মাসুদ পারভেজ রাইজিংবিডিকে বলেন, 'নায়িকা হ্যাপি যখন এসে থানায় অভিযোগ করেন এবং ঘটনা খুলে বলেন, তখন তাকে বলা হয়, এটা ধর্ষণ মামলা হবে। আপনার দৃষ্টিতে যা প্রতারণা, নারী নির্যাতন আইনে তা ধর্ষণ। আইনের ভাষায় জোরপূর্বক ধর্ষণ আর আপনার ভাষায় প্রতারণা করে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সেক্সুয়াল অ্যাসাল্ট— দুটো একই বিষয়। আপনার সঙ্গে তো টাকা নিয়ে প্রতারণা করে নি। এ রকম করে থাকলে ৪২০ ধারায় মামলা করেন। তখন হ্যাপি বুঝে সজ্ঞানে মামলার কাগজে স্বাক্ষর করেন। এখন উনি যদি অস্বীকার করেন, তাহলে করার কিছু নেই। আপনি জলে নামবেন আর কাপড় ভেজাবেন না, তা তো হবে না।'

কী সাংঘাতিক!! আইন কি আছে? আছে তো। কিন্তু আইনের কী করুণ ব্যাখ্যা।

পরবর্তী সময়ে হ্যাপি আদালতে গিয়ে প্রতারণা মামলারও সিদ্ধান্ত নেন। হ্যাপি বলেন, রুবেল বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে প্রেমের নামে প্রতারণাই শুধু করেন নি, আর্থিক প্রতারণাও করেছেন। এ বিষয়ে আদালতে মামলা করা হবে। হ্যাপির কাছ থেকে রুবেল একাধিক দামি মোবাইল সেট কৌশলে হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়। এ ছাড়া কিছু আর্থিক লেনদেনের বিষয়ও রয়েছে। এ সব বিষয়ে আদালতে আরেকটি প্রতারণা মামলা হবে। এই তো, সেটাই স্টাবলিশ করা গেল যে, 'টাকা নিয়েই প্রতারণা' হয়েছে। আইনের ভাষা বোঝার যে পুলিশি-অক্ষমতা, সেটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য। পুলিশ অপরাধের শিকার নারীটিকে যেভাবে বোঝালেন, তাকে সেভাবেই বুঝতে হলো। তার মানে প্রতারণা কেবল অর্থের সাথে সম্পৃক্ত। আইন আছে!!

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিবাহশর্তবিহীন কিংবা বিবাহবহির্ভূত পরকীয়া প্রেমের প্রচুর উদাহরণ সমাজে রয়েছে। বর্তমান সময়ে অবিবাহিত নারী-পুরুষও অনেক ক্ষেত্রেই কোনো পরিণতির প্রত্যাশা না রেখে চুক্তিবহির্ভূত সম্পর্কে হামেশাই যাচ্ছেন; এবং যখন যাচ্ছেন তখন তাদের যে পরিণত আচরণ করা উচিত সেটা তারা করছেন না, সমস্যার মূল আসলে এখানে। বিবাহিত এবং বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের মূল পার্থক্য হলো একটা কেবল স্বাক্ষর দিয়ে না-টেকানো যায় আরেকটা যেকোনোভাবেই যায়। এমনকি আলাপ আলোচনা না করেও। কিন্তু শারীরিক লাঞ্ছনা, শারীরিক নির্যাতন উভয় ক্ষেত্রে একইরকম হতে পারে। আর পরেরটার ক্ষেত্রে সামাজিক হেনস্থা শতগুণ বেশি। যেখানে সাক্ষী রেখে স্বাক্ষর করা আছে, সেখানে পারস্পরিক অভিযোগের ভিত্তিতে পুনঃস্বাক্ষর দিয়ে সরে আসার রীতি আছে। কিন্তু স্বাক্ষরহীন সম্পর্ক থেকে সরে আসার কোনো ব্যাখ্যা নেই। সমাজে তৈরি হয় নি এখনো। কিন্তু ব্যাখ্যা থাকা উচিত।

ফলে এ ধরনের সম্পর্কে মানে স্বাক্ষরহীন সম্পর্কে না-থাকার বাস্তবতা তৈরি হলে ব্যক্তি কীভাবে সেটা নিষ্পত্তি করবেন তা নির্ধারিত হবে কীভাবে? একইসাথে দুজনের যেকোনো একজন যদি না-থাকার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তার করণীয় কী? সেক্ষেত্রে আদৌ কোনো 'দায়িত্ববোধ' বা 'সম্মানবোধ' কাজ করে নাকি কেবল ফোন না ধরা, বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত, একসাথে না থাকা, কথা বলা বন্ধ করা, পরস্পরের বিস্তর অভিযোগ দিয়ে বন্ধু পরিসরে এক ধরনের পরিচয় তৈরি করতে বাধ্য করা, রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে পরস্পরকে হেনস্থা করা, নাকি ভিন্ন কিছু?

ধরা যাক, যেকোনো একজন পুরুষ কোনো নারীকে বিয়ে করার কথা দিয়ে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেন এবং 'বিবাহিত দম্পতির মতো' থাকা শুরু করলেন। তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হলো। কিন্তু পরে বিবাহে অস্বীকৃতি জানালেন। নারীটি এক্ষেত্রে কী কী 'প্রতিকার' পেতে পারেন? (কেবল নারীর

কথা বলার কারণ, এ ধরনের সম্পর্কে আমাদের সমাজে সাধারণত পুরুষের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়। সেই 'সাধারণের' বিষয়েই আলাপ।)।

প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করতে পারলে প্রতারণার প্রতিকারও তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সেটা দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তাবনা। বরং, অভিযুক্তের হাতে অনেক বেশি সুযোগ থাকবে অভিযোগটিকে ভিন্ন খাতে ঠেলে দেয়ার।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বা নির্যাতন পৃথিবীজুড়েই রয়েছে, বাংলাদেশে তার ভয়াবহতা এবং দৃশ্যমানতা বেশি। সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কিত একটি অবকাঠামোমূলক বৈশিষ্ট্য এটি। আভিধানিক অর্থে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বা নির্যাতন মানে হচ্ছে লিঙ্গীয় অবস্থানগত কারণে দুই বা ততধিক ব্যক্তির মধ্যে সহিংসতা বিরাজ করা। বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় এখানে পুরুষ 'ক্ষমতাবান', নারী 'নির্যাতিত'। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিসরে পুরুষতান্ত্রিক দাপট নারীকে সহিংসতার শিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং ধারাবাহিক ফলোআপের অভাবে আমরা জানতে পারি না, কোন ঘটনার পরিণতিতে কী ঘটছে।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, বাংলাদেশের নারী অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী লিঙ্গ সম্পর্কিত মাপকাঠির বিবেচনায় বৈশ্বিক পর্যায়ে ১৭৪ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৪তম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক পরিচালিত ২০১১ সালের জরিপ মতে, ৮৭ শতাংশ নারী স্বামীর দ্বারা কোনো না কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হন। জাতিসংঘের বিশেষ রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশে ৬০ শতাংশ বিবাহিত নারী জীবনে কোনো না কোনো সময়ে স্বামী কিংবা তার পরিবার বা উভয়ের দ্বারা নির্যাতিত হন। কিন্তু শাস্তি? পরিমাণ? আইন তো আছে!!

নারী নির্যাতন বন্ধে প্রচলিত আইনের পাশাপাশি বাংলাদেশে ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন পাস করা হয় এবং ২০০৩ সালে কিছু সংশোধনী আনা হয়। এ আইনে বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী ও শিশু অপহরণ, আটক করে মুক্তিপণ আদায় বা দাবি, নারী ও শিশু পাচার, নারী ও শিশু ধর্ষণ বা ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু ঘটানো, যৌন পীড়ন, যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অঙ্গহানি করা, ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান সম্বলিত অপরাধের বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়গুলো এসেছে।

আমাদের জন্য ন্যূনতম যে আইনগুলো আছে

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ সংশোধিত, ২০০৩ (২০০০ সনের ৮ নম্বর আইন)
পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০
যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০
১৯৮০ সনের ৩৫ নম্বর আইন
বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯
[১৯২৯ সনের ১৯ নম্বর আইন]
এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২

একটু লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এই আইনের অপরাধগুলোতে শারীরিক আঘাতের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু আমরা মানবাধিকার বলতে বুঝি, মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার। এখানে মর্যাদা

বলতে শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক বিষয়গুলো বোঝানো হয়েছে। কিন্তু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মানসিক এবং আর্থিক বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয় নি। আর সেখানে 'সামাজিক পারিবারিকভাবে স্বীকৃত' নয় এমন সম্পর্কে আপনার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে কোন আইন আপনাকে বিচারিক নিশ্চয়তা দিবে? আইন আমাদের আছে, কিন্তু সে আইন মানুষকে তাদের নিজ ইচ্ছেয় গড়ে ওঠা 'অস্বীকৃত' সম্পর্ক এবং তার আচরণকে চ্যালেঞ্জ করার কোনো সুযোগ দেয় না।

হ্যাপির কথায় ফিরে আসি। তিনি গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, আমি যখন বুঝতে পারলাম রুবেল আমাকে এড়িয়ে চলছে, সে আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না; অথচ অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার খবর আমার কানে আসছে, তখন আমি তার কাছে জানতে চাই। হ্যাপি আরো বলেন, এরপর বিয়ের কথা বলতে গেলে সে যখন আমার গায়ে হাত তোলে, তখন আমি মামলা করার সিদ্ধান্ত নিই। আমি কারো সঙ্গে পরামর্শ না করেই সরাসরি পুলিশের কাছে গিয়ে ঘটনা খুলে বলি।

এই ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় নারীর প্রতি সব ধরনের নির্যাতন বন্ধে হাজারো আইন আসলে তাকে কতটা নিরাপত্তা দিতে পারে। আবার ভিন্ন বাস্তবতাও আছে। এ দেশের বেশির ভাগ পুলিশ এখনো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন নিয়ে বেশি জানেনই না। ফলে তারা ব্যক্তিগত যেকোনো সংঘর্ষে নারী নির্যাতন মামলা রুজু করাতে ষড়যন্ত্র করেন এবং তারপর সে মামলাটি টেকে না। এবং এর ফলে যা দাঁড়ায় তা হলো, ৮০ শতাংশ মামলা যে ভুয়া সেটা আমরা প্রমাণ করে প্রচার করে ফেলছি। এর পিছনের রাজনীতিটা ভাবার সময় আর তখন আমাদের নেই। নারী নিরাপত্তায় সবচেয়ে কঠিন আইনটিকে আমরা হেয় প্রতিপন্ন করে ছেড়ে দিলাম।

সবচেয়ে বড়ো ক্ষতির বিষয় হলো আমাদের প্রচলিত আইনগুলো সম্পর্কে সম্পৃক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও ঠিকমতো জানা বোঝা দাঁড়ায় নি। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণার যেমন অভাব আছে, আইনটি আসলেই কতটুকু প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে, তা জানার জন্য জাতীয় পর্যায়ে কোনো নজরদারিরও ব্যবস্থা নেই।

শেষ করব আবারও হ্যাপি রুবেলের কথা তুলেই। ধরা যাক, হ্যাপি যদি শো-বিজের কেউ না হতেন কিংবা রুবেল যদি আপনার পাশের বাসার কোনো 'ননস্টার' ছেলে হতো, তাহলে এ মামলার রূপ কী হতো? গণমাধ্যম কী তাদের কথোপকথন প্রচারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করত, নাকি সেই সাধারণ ছেলেটির জামিন হতো? আইন আছে বটে!

আবার নির্যাতনের শিকার বলে নিজেকে হাজির করা হ্যাপি যখন তার ডাক্তারি পরীক্ষার পর মিডিয়াকে জানান, রুবেল তাকে বিয়ে করলেই মামলা তুলে নিবেন; তখন আরও প্রশ্ন জন্ম নেয়। যিনি কিনা কারোর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনছেন সেটার সমাধান সেই ধর্ষণের অপরাধের শাস্তি দিয়েই শেষ হতে হয়, ধর্ষণের শিকার নারীর সাথে বিয়ে দেয়া বা করার মধ্য দিয়ে নয়। হ্যাপি ও রুবেলের পক্ষে বিভাজিত হয়ে যাওয়া জনগণ এই বিতর্কে নানা প্রশ্ন তোলার সুযোগ পেয়েছেন।

একজন নারীর তার ধর্ষকের সাথে পুনরায় সম্পর্কিত হওয়ার ইচ্ছে পোষণ নিয়েও নানা সমালোচনা হয়েছে। এ দায় কেবল হ্যাপিকে দেওয়া এক ধরনের দায় এড়ানোই বলা যেতে পারে। নারী জাগরণের নামে যে নাইন-টু ফাইভ ফেমিনিজম চর্চা করছি আমরা এবং সমাজকে না বুঝে মাজ পরিবর্তনের যে চূড়ান্ত অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা লালন করছেন অগ্রজরা, সেখানে রিভিউ করার সময় এসেছে। একজন হ্যাপির বেড়ে ওঠা এবং তার মানসিক বৃদ্ধি ও বোধের অপরিপক্কতার কথা বলে দায় এড়াবেন না। এমন

লক্ষ হ্যাপিই তো চারপাশে, তাদের সঠিক পথটা চেনানো যাবে তখনই যখন আমরা সঠিক পথে হাঁটতে পারব। যা এখনো এমনিতেই এবড়োথেবড়ো। মানে হলো, সহজ ভাষায় আমরা তাদের অধিকার-বোধের জায়গাটা ধরিয়ে দিতে পারি নি।

উদিসা ইসলাম সাংবাদিক, ঢাকা ট্রিবিউন। udisaislam@gmail.com